CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৩ সংখ্যা ২ | আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স | জুন ২০০৫

ভেতরের পাতায় . . .

৫ প্রাথমিক স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য একটি কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন)

১১ বাংলাদেশে ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ওপর দেশব্যাপী সমীক্ষা

১৮ সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

বাংলাদেশে বহু ওষুধ-প্রতিরোধী বিশেষ ধরনের এক *ভিব্রিও কলেরি* O১-জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে যা এর আগে কখনোই দেখা যায় নি

মারাত্মক পানিশূন্যতা সৃষ্টিকারী *ভিব্রিও কলেরি*জনিত ডায়রিয়ায় (কলেরায়) কার্যকর জীবাণুনাশক দ্বারা চিকিৎসা করলে মলের পরিমাণ এবং অসুস্থতার মেয়াদ কমে আসে। আমরা এখানে *ভিব্রিও কলেরি* O১ জীবাণুর এমন একটি নতুন প্রজাতির আবির্ভাবের কথা বলছি যা টেট্রাসাইক্লিন, ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, ফুরাজোলিডোন এবং ইরিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক।

বাংলাদেশে কোনো কোনো ঋতুতে *ভিব্রিও কলেরি* O১ জীবাণুদ্বারা সংঘটিত কলেরা রোগই মারাত্মক পানিশূন্যতাজনিত ডায়রিয়ার প্রধান কারণ (১)। উক্ত পানিশূন্যতার চিকিৎসায় সময়মত শিরায় প্রয়োগযোগ্য স্যালাইন রোগীর জীবন-রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে। তবে কার্যকর একটি জীবাণুনাশক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করলে ডায়রিয়ার মেয়াদ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ডায়রিয়ার মেয়াদ কম হলে রোগীর হাসপাতালে থাকার মেয়াদ কমে যায়। এর ফলে পানিশূন্যতার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় স্যালাইনের ব্যবহার কমে যায় এবং *ভিব্রিও কলেরি* জীবাণু বিনাশের কারণে মলের জীবাণু নিষ্ক্রমণের মেয়াদ কমে যায়; ফলে পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অন্যান্য রোগীদের মধ্যে এ-জীবাণুর সংক্রমণও কমে যায় (২)। বাংলাদেশে কমবয়সী শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের ছাড়া বাকি সকলের ক্ষেত্রে মারাত্মক কলেরা রোগের চিকিৎসায় জীবাণুনাশক ওষুধ হিসেবে টেট্রাসাইক্লিনের (এবং দীর্ঘমেয়াদি টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন) ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে (১,২)। *ভিব্রিও কলেরি* থেকে উদ্ভুত একটি সংবেদনশীল (সাস্‌সেপটিবল) জীবাণুদ্বারা সংঘটিত মারাত্মক কলেরা রোগের চিকিৎসায় বিকল্প অন্যান্য জীবাণুনাশক ওষুধগুলো হচ্ছে ফুরাজোলিডোন, ইরিথ্রোমাইসিন, ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল (টিএমপি-এসএমএক্স) এবং ক্লোরামফেনিকল (৩)।

আনুমানিক দুই লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুসিত আইসিডিডিআর,বি-র মতলব

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

ডেমোগ্রাফিক সার্ভিলেন্সের আওতাধীন এলাকা থেকে মতলব ডায়রিয়া হাসপাতালে আগত সকল ডায়রিয়া রোগীর মলের কালচার করা হয়, ফলে ওইসব রোগী *ভিব্রিও কলেরি* এবং অন্যান্য আন্ত্রিক জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলো কি না তা জানা যায়। আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে (কলেরা হাসপাতাল নামে বহুল পরিচিত) ডায়রিয়া নিয়ে আগত সকল রোগীদের মধ্য থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে শতকরা দুইভাগ রোগীর মলের নমুনা একইভাবে পরীক্ষা করা হয়।

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে মতলব হাসপাতালে চিকিৎসাধীন *ভিব্রিও কলেরি* **O১** দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের মধ্য থেকে ছয়টি জীবাণু সনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো ছিলো ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজোলিডোন এবং ইরিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক। পরবর্তী পাঁচ মাসে ঢাকা এবং মতলবের উভয় হাসপাতাল থেকে নিয়মিতভাবে একই ধরনের জীবাণুনাশক ওষুধ-প্রতিরোধক জীবাণু সনাক্ত করা হয় (চিত্র ১)। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে মতলব হাসপাতালের ১১টি *ভিব্রিও কলেরি* জীবাণুর মধ্যে পাঁচটি (৪৫%) এবং ঢাকা হাসপাতালের ৫৪টির মধ্যে ৪৩টি (৭৯%) জীবাণু একই ধরনের বহু ওষূধ-প্রতিরোধী ছিলো। উপরন্তু, মঠবাড়িয়া এবং বাকেরগঞ্জে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র সার্ভিলেন্স এলাকা থেকেও অতি-সম্প্রতি একই ধরনের বহু ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণু সনাক্ত করা হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ১: ঢাকা ও মতলবে ভিব্রিও কলেরি ***O১*** *জীবাণুর ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজোলিডোন এবং ইরিথ্রোমাইসিন ওষুধ প্রতিরোধের মাস-ভিত্তিক শতকরা হার*

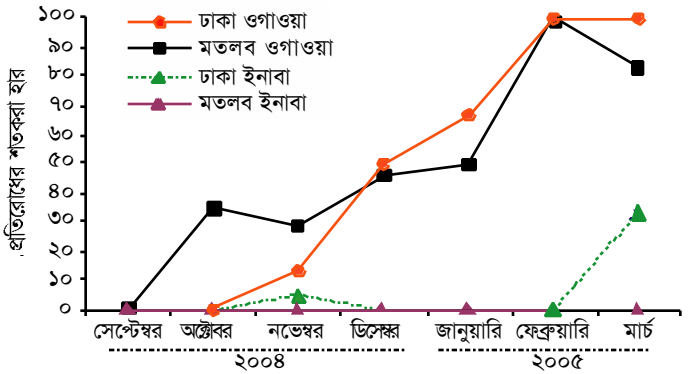

ল্যাবরেটরিতে 'ডিস্ক ডিফিউশন' পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বহু জীবাণুনাশক ওষুধ-প্রতিরোধী *ভিব্রিও কলেরি*-র এই জীবাণুগুলি ক্লোরামফেনিকল এবং সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-এর প্রতি সংবেদনশীল। তবে চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেছেন যে এই জীবাণুগুলো দ্বারা সৃষ্ট কলেরার চিকিৎসায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ব্যবহার করে কয়েক বছর আগের গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না (৪,৫)। বর্তমান জীবাণুর 'মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেন্ট্রেশন'-এর মাত্রা হলো প্রতি মিলিলিটারে ০.৩৮-০.৫ মাইক্রোগ্রাম সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, কিন্তু ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে *ভিব্রিও কলেরি* জীবাণুর ক্ষেত্রে এর গড় ছিলো ০.০১২৫ মাইক্রোগ্রাম (৪)।

*চিত্র ২: বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে ভিব্রিও কলেরি **O১** জীবাণু ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজোলিডোন এবং ইরিথ্রোমাইসিন ওষুধ প্রতিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে*

প্রতিবেদক: ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন এবং ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি

মন্তব্য

আইসিডিডিআর,বি এই প্রথম বিশেষ ধরনের এক *ভিব্রিও কলেরি* **O১** জীবাণু সনাক্ত করেছে যা ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজোলিডোন, এবং ইরিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক। *ভিব্রিও কলেরি*-র চিকিৎসায় সচরাচর ব্যবহৃত জীবাণুনাশক ওষুধসমূহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত জীবাণুর এরূপ বড় ধরনের প্রতিরোধ-ক্ষমতা লাভের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে কলেরা রোগীদের অবস্থানের মেয়াদ বেড়ে গেছে। ফলে হাসপাতালে রোগীর ভীড় বেড়ে গেছে, ক্ষণস্থায়ী তাঁবুতে হাসপাতাল-সম্প্রসারণ করতে হয়েছে, অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রয়োজন পড়েছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রয় করতে হয়েছে এবং চিকিৎসা খরচ বেড়ে গেছে।

ইতোপূর্বে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ঢাকা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে মারাত্মক কলেরা রোগীর চিকিৎসায় পূর্ণ-বয়স্ক রোগী এবং ৩০ কেজির বেশি ওজনের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের এক গ্রাম সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের এক-মাত্রা ডোজ এবং দুই বছরের বেশি-বয়সী শিশুকে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম হিসেবে সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের একটি মাত্র ডোজ দেওয়া হয় (৪,৫)। গর্ভবতী এবং শিশুকে বুকের দুধদানকারী মায়েদের কোনো জীবাণুনাশক ওষুধ দেওয়া হয় না। যদিও 'ডিস্ক ডিফিউশন' পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জীবাণুটি সিপ্রোফ্লোক্সাসিনে এখনো সংবেদনশীল, কিন্তু ১৯৯৫ সালে গবেষণার তুলনায় এ-জীবাণুগুলির 'মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেন্ট্রেশন' শতগুণ বেড়ে গেছে এবং চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, এই ওষুধটিও কার্যকর মনে হচ্ছে না, ফলে এ'টির ব্যবহার আর যথোপযোগী নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই বহু ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণুটি ক্লোরামফেনিকলে এখনো সংবেদনশীল রয়েছে। চল্লিশ বছর আগে ঢাকায় পরিচালিত দৈবচয়নের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, ক্লোরামফেনিকল দ্বারা মারাত্মক *ভিব্রিও কলেরি* রোগীর চিকিৎসায় রোগীর ডায়রিয়ার মেয়াদ এবং পায়খানার পরিমাণ কমে যায় (৬,৭)। ২৫ কেজি বা তার বেশি ওজনের একজন রোগীর চিকিৎসায় ৫০০ মিলিগ্রাম ক্লোরামফেনিকল ছয় ঘন্টা পরপর তিনদিনব্যাপী এবং ২৫ কেজির কম ওজনের রোগীকে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য প্রতিবারে ১২.৫ মিলিগ্রাম করে ক্লোরামফেনিকল দ্বারা ছয় ঘন্টা পরপর তিনদিনব্যাপী চিকিৎসা করা হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশনের দূষিত পানির সংস্পর্শে আসার ফলে পানীয় পানি এবং খাবার দূষিত হয়। কলেরা প্রতিরোধের কার্যাবলির মধ্যে পানি ও খাবারের মধ্যে এ-জাতীয় দূষণ কমানোর ওপর জোর দেওয়া উচিত। ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে পানিশূন্যতা রোধে খাবার স্যালাইন রোগীর জীবন বাঁচাতে এখনো প্রধান ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার আগামী সংখ্যাগুলোতে *ভিব্রিও কলেরি* জীবাণুর জীবাণুনাশক ওষূধ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল প্রচার অব্যাহত থাকবে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

প্রাথমিক স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য একটি কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন)

অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)-র মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো– স্বাস্থ্যকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, রোগাক্রান্ত শিশুর সময়মত চিকিৎসা সম্পর্কে পরিবারবর্গকে শিক্ষিত করে তোলা এবং যথাযথ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা-পদ্ধতি উন্নত ও শক্তিশালী করা। বাংলাদেশের মতলব উপজেলায় অবস্থিত বিশটি প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে দৈবচয়নের (র‍্যানডোমাইজেশন) মাধ্যমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার ১০টিতে আইএমসিআই কার্যক্রম চলছে এবং ১০টি আইএমসিআই কার্যক্রমের আওতা-বহির্ভূত (কমপারিজন)। আইএমসিআই গবেষণা কার্যক্রম শুরুর আগে এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সেবা নিতে আসা শিশুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশুর ক্ষেত্রেই শুধু পুরোপুরি রোগ নির্ণয় অথবা সঠিকভাবে তাদের চিকিৎসা করা হতো। আইএমসিআই কার্যক্রম বাস্তবায়নের দু'বছর পরে আইএমসিআই সেবাকেন্দ্রগুলোতে প্রতিটি শিশুর সঠিক চিকিৎসার গড় সূচি ছিলো ৫৪, যেখানে আইএমসিআই-এ অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে এ সংখ্যা ছিলো মাত্র ৯। আইএমসিআই স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আইএমসিআই কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শিশু-প্রতি বছরে পরিদর্শনের হার ছিলো ০.৬, যা এখন বেড়ে গিয়ে ১.৯-এ উন্নীত হয়েছে। আইএমসিআই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সরকারের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে অসুস্থ শিশুদেরকে প্রদত্ত সেবার মান বেড়ে গেছে এবং সেই সাথে আইএমসিআই সেবাকেন্দ্রসমূহের ব্যবহারও বেড়ে গেছে।

শিশুদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং তাদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে অসুস্থ শিশুদের জন্য সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই) কার্যক্রম/কৌশল প্রবর্তন করে। তিনটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া আইএমসিআই কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যথা– ১) স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো, ২) শিশুস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কমিউনিটিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, এবং ৩) শিশুস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রমসমূহকে আরো শক্তিশালী করা (১)। বাংলাদেশ সরকার, আইসিডিডিআর,বি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে একটি আইএমসিআই কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন) এবং এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চালু রয়েছে। এ-কর্মসূচির উন্নয়ন-সংক্রান্ত খবর এবং প্রাথমিক ফলাফল ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে (২,৩)। এ-নিবন্ধে প্রথম দু'বছরের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

মতলব উপজেলার যে এলাকায় আইসিডিডিআর,বি শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে না, সেখানে আইএমসিআই গবেষণা কার্যক্রম চলছে। গবেষণা এলাকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৫০,০০০। গবেষণা এলাকার ২৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মধ্যে ২০টি এবং এর আওতাভূক্ত (ক্যাচমেন্ট) এলাকাসমূহকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত করা হয়। বাকি চারটি কেন্দ্রকে গবেষণা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি কারণ সেখানকার মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আইসিডিডিআর,বি থেকে শিশুস্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে এবং সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে কোনো সেবা গ্রহণ করে না। বিশটি সেবাদানকেন্দ্র ও এর আওতাভুক্ত এলাকাকে সেবাকেন্দ্রের ধরন, এর ভৌগলিক অবস্থান, কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময়ের (বেজলাইন) মৃত্যুহার এবং সেবাকেন্দ্রের আওতাভুক্ত জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রথমে জোটবদ্ধ করে পরবর্তীতে গুচ্ছভিত্তিক দৈবচয়নের মাধ্যমে ভাগ করা হয়।

কর্মসূচি-ব্যবস্থাপক, নীতি-নির্ধারক, সরকারি-কর্মকর্তা এবং গবেষকদের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা এবং তাঁদের মধ্যে নিবিড়ভাবে মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে আইএমসিআই

কার্যক্রম এবং সেবা প্রদানের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। গবেষণা এলাকার যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র আইএমসিআই-এর আওতা-বর্হিভূত সেগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং সুপারভাইজারদের পরিদর্শনের সাধারণ নিয়ম মেনে চলা হয়।

২০০১ সালের নভেম্বর এবং ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আইএমসিআই-এর আওতাধীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রেফারেল হাসপাতালের উভয় ব্যবস্থাপনায় কর্মরত মোট ৩৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক সুপারিশকৃত বাংলাদেশে আইএমসিআই ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়োগের ওপর ১১ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (৪,৫)। এছাড়া মায়েরা কীভাবে তাঁদের শিশুদেরকে বুকের দুধ পান করাবেন তার পরামর্শ-সংক্রান্ত তিনদিনের একটি প্রশিক্ষণও তাঁদের প্রদান করা হয়। পরে এ-প্রশিক্ষণেরই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য রেফারেল হাসপাতালের ডাক্তারসহ বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সুপারভাইজারগণ স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিলো তাৎক্ষণিক পরামর্শসহ রোগীর ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আইএমসিআই রোগী-ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে সেগুলোর সমাধানের উপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা (৭)।

আইএমসিআই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত এবং এর আওতা-বহির্ভূত উভয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য বাংলাদেশ সরকার নিয়মিতভাবে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। আইএমসিআই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং আইসিডিডিআর,বি-র গবেষক দল সেখানে অতিরিক্ত ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যৌথভাবে কাজ করেছে। এজন্য তাঁরা একদিকে যেমন সরাসরি ওষুধ ক্রয় করেছে, তেমনি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহেও যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছে। সকল আইএমসিআই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ওজন পরিমাপক যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার পরিমাপের জন্য টাইমার, থার্মোমিটার, চার্ট-বই এবং মাদের পরামর্শ দেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে ব্যবহারোপযোগী 'মাকে পরামর্শ দান' কার্ড সরবরাহ করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সঠিকভাবে স্বাস্থ্যকর্মীর কর্মদক্ষতা যাচাই করার লক্ষ্যে আইএমসিআই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়মিত রেকর্ডিং-এর জন্য যে ফরম ব্যবহার করা হতো তা কিছুটা পরিবর্তন করে আরো ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

কখন, কীভাবে এবং কোথায় রোগীকে রেফার করা হবে, তার সুস্পষ্ট উল্লেখসহ একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে তা বিতরণের মধ্য দিয়ে রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেবার মান বাড়ানো হয়। তাছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে রেফারেল হাসপাতালে রোগী পাঠানোর ক্ষেত্রে রোগীর তথ্যাবলি সংরক্ষণ করার জন্য একটি রেফারেল ফরম তৈরি করা হয়; এবং প্রাথমিক ও রেফারেল উভয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের উল্লিখিত নীতিমালা এবং ফরমসহ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যবহারের ওপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রত্যেকটি আইএমসিআই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র মাসে একবার পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে

বাংলাদেশ সরকার এবং আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে কেন্দ্রসমূহ তদারকি করছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি একটি পরিদর্শন তালিকার ওপর ভিত্তি করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পরিদর্শন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো– সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে কি না তা মূল্যায়নের জন্য রোগীর তথ্যসম্বলিত ফরম পরীক্ষা করে দেখা (বিশেষ করে পরিদর্শনকালে মারাত্মক অসুস্থ যেসব রোগী সব সময় পাওয়া যায় না তাদের ফরমসমূহ), রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনা এবং তাৎক্ষণিক পরামর্শ সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা, ওষুধের সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে কি না তা পরীক্ষা করা এবং আইএমসিআই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো অযাচিত বাধা-বিপত্তি আছে কি না তা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বের করা।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে আইএমসিআই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে ২০০০ সালের আগস্ট এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই জরিপে রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা/পরামর্শকে ০-১০০ সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই সূচকগুলোকে সঠিক এবং উন্নতমানের সেবার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে দেখা গেছে (৮)। ২০০৩ সালের আগস্ট এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে বিশটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সবগুলোতেই পুনরায় এই স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আইএমসিআই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে গবেষণা এলাকার সবগুলো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে শিশুর রোগ নির্ণয় মান ছিলো আইএমসিআই-এর সুপারিশকৃত মানের তুলনায় খুবই নিম্নমানের (সারণি ১)। কোনো শিশুর মধ্যে রোগের বিপজ্জনক চিহ্ন ছিলো কি না তা পরীক্ষা করা হয় নি। খুব কম শিশুকেই কাশি, ডায়রিয়া, জ্বর অথবা অন্য কোনো অসুখের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। শিশুর তত্ত্বাবধায়ককে শিশুর শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসা ও রোগ-ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে খুব কম সচেষ্ট দেখা গেছে। ফলে যেসব শিশুর খাবার স্যালাইন এবং/অথবা খাওয়ার জন্য জীবাণুনাশক (এন্টিবায়োটিক) ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছিলো তাদের তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি দশজনের মধ্যে মাত্র প্রায় একজন জানতেন যে কীভাবে ওষুধ খাওয়াতে হয়। সর্বোপরি রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূচকের গড় ফলাফল ছিলো সর্বাধিক ১০০-এর মধ্যে ২৩।

দশটি আইএমসিআই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এবং আইএমসিআই-এর আওতা-বহির্ভূত দশটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগীর রোগ নির্ণয় এবং সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা-সম্বলিত ফলাফলের গড় দেখানো হয়েছে চিত্র ১ এবং ২-এ, যা আইএমসিআই কার্যক্রম শুরু করার পূর্বের এবং কার্যক্রম শুরু করার আনুমানিক ১৮ মাস পর যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা থেকে নেওয়া (সর্বাধিক সম্ভব ফলাফল ছিলো ১০০)। রোগ নির্ণয় এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত উভয় ক্ষেত্রে প্রতিফলিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আইএমসিআই-এর আওতা-বর্হিভূত সেবাদান কেন্দ্র থেকে আইএমসিআই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত শিশুরা অনেক ভাল সেবা-যত্ন পেয়েছে। আইএমসিআই-এর আওতা-বহির্ভূত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে সেবার মান এ-সময়ের মধ্যে উন্নত হয় নি।

সারণি ১: ২০০০ সালে বাংলাদেশের মতলব উপজেলার প্রাথমিক স্তরের সেবাদান কেন্দ্রে সেবাপ্রদানকারীদের দ্বারা নির্দিষ্ট রোগী-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সেবাপ্রাপ্ত শিশু ও তত্ত্বাবধায়কের অনুপাত

সূচকসমূহ	সেবার জন্য যোগ্য শিশু অথবা তত্ত্বাবধায়ক	সেবাপ্রাপ্তদের শতকরা হার (সংখ্যা) অথবা গড়
অসুস্থ শিশুদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা		
তিনটি বিপজ্জনক চিহ্ন পরীক্ষা করা হয়েছে এমন শিশু[১]	২৮৪	০ (০)
যেসব শিশুর কাশি, ডায়রিয়া এবং জ্বর পরীক্ষা করা হয়েছে	২৮৪	১৪.৭ (৪৩)
গ্রোথচার্ট-এর সাহায্যে শিশুর ওজন পরীক্ষা	২৮৪	০ (০)
দুই বছরের কম-বয়সী শিশুর খাদ্যাভাস নিরূপণ[১]	১৫৩	০ (০)
অন্যান্য সমস্যার জন্য পরীক্ষিত শিশু	১১৪	১১.৯ (১৫)
খুব কম ওজনের শিশুর খাদ্য সমস্যা নিরূপণ[১]	৪৭	১.৩ (১)
সমন্বিত নিরূপণের সূচক (গড়) (রেঞ্জ ০-১০০)[১]	২৮৪	২৩.০[২]
অসুস্থ শিশুদের শ্রেণীবিন্যাস		
সঠিকভাবে শ্রেণীবিন্যাসকৃত শিশু	২৭৪	১৯.৯ (৫৬)
সঠিকভাবে শ্রেণীবিন্যাসকৃত খুব কম ওজনের শিশু[১]	৪৯	১.৮ (১)
অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা প্রদান		
সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্ত নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশু	৬৪	১২.৫ (৮)
সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্ত ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু	০	০ (০)
সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্ত রক্তাল্পতায় আক্রান্ত শিশু	৪৩	০ (০)
জীবাণুনাশক (এন্টিবায়টিক) ওষুধ খাইয়ে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্ত শিশু	১১০	১১.১ (১২)
জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োজন নেই এমন শিশু যারা ওষুধ ছাড়াই সেবাকেন্দ্র ছেড়ে চলে গেছে	১৬৪	৩৮.৮ (৬৮)
সেবাকেন্দ্রে প্রথম ডোজ সেবাপ্রাপ্ত শিশু[১]	৯৭	০ (০)
রেফার করা প্রয়োজন এমন শিশুদের মধ্যে যাদের রেফার করা হয়েছে	৮	৪৫.৪ (৪)
অসুস্থ শিশুর তত্ত্বাবধানকারীকে উপদেশ এবং কাউন্সেলিং দেওয়া হয়েছে		
অসুস্থ শিশুর তত্ত্বাবধায়ককে শিশুকে অতিরিক্ত পানীয় প্রদান এবং খাবার চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে[১]	২৬৮	৫.৩ (১২)
খাওয়ার ওষুধে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে এমন শিশু: কীভাবে শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে হবে সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে	১৮৪	৯.০ (১৩)
কোন্ অবস্থায় শিশুকে আবারো তাড়াতাড়ি সেবাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে সে ব্যাপারে শিশুর তত্ত্বাবধায়ককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে[১]	২৭৪	০.৬ (১)
সঠিক পরামর্শপ্রাপ্ত খুব কম ওজনের শিশুর তত্ত্বাবধায়ক[১]	৪৭	২.১ (১)
খাবার স্যালাইন এবং/অথবা জীবাণুনাশক ওষুধ কীভাবে খাওয়াতে হবে সে-সম্পর্কে জ্ঞাত শিশুর তত্ত্বাবধায়ক	১৮৮	৯.৪ (১৬)

[১] আইএমসিআই নির্ভর সূচক

[২] বিভিন্ন ধরনের সূচকের গড় এবং রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শতকরা হার আনুমনিক, তবে সংখ্যাসমূহ প্রকৃত সুতরাং এটা প্রকৃতরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

চিত্র ১: দশটি আইএমসিআই (বেজলাইনে মাত্র নয়টি) এবং দশটি আইএমসিআই আওতা-বহির্ভূত সেবাকেন্দ্রে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের সূচক

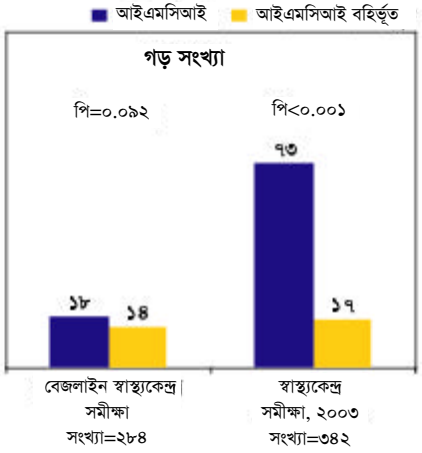

চিত্র ২: দশটি আইএমসিআই (বেজলাইনে মাত্র নয়টি) এবং দশটি আইএমসিআই আওতা-বহির্ভূত সেবাকেন্দ্রে সঠিকভাবে চিকিৎসা এবং পরামর্শ-সংক্রান্ত সূচক

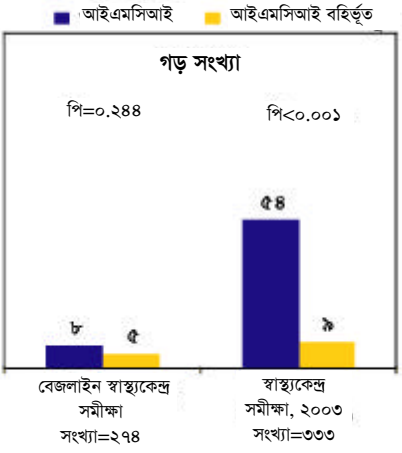

আইএমসিআই চালু হওয়ার পর এ-ব্যবস্থা যেসব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চালু হয়েছে সেসব স্থান থেকে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য শিশুদের উপস্থিতি নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়, যেখানে আইএমসিআই-এর আওতা-বর্হিভূত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রেসমূহে শিশুদের উপস্থিতির হার কমে যায় (চিত্র ৩)। আইএমসিআই স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে বছরে শিশু-প্রতি পরিদর্শনের হার ২০০১ সালের শেষার্ধে যা ছিলো ০.৬, আইএমসিআই কৌশল বাস্তবায়নের ২১ মাস পর তা বেড়ে গিয়ে ১.৯-এ উন্নীত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-সংক্রান্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে যেখানে মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত মাত্র ৩৭ জন শিশু আইএমসিআই থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, সেখানে ২০০৩ সালের দ্বিতীয় তিনমাসে এ-সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬ জনে পৌঁছেছে। তবে মারাত্মকভাবে অসুস্থ এই ১২৬ জনের মধ্যে মাত্র ৯৪ জন রেফারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে রেফারেল হাসপাতালে রোগী যাওয়ার হার যদিও বেড়েছে, তথাপি সুপারিশকৃত রেফারেলের তুলনায় তা কম।

প্রতিবেদক: পাবলিক হেল্‌থ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি; ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল হেল্‌থ, জনস্ হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ, বাল্টিমোর, যুক্তরাষ্ট্র; ইউনিভার্সিডাড ফেডারেল ডি পেলোটাস, পেলোটাস, ব্রাজিল

অর্থানুকুল্য: বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত); ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিএ নং ৩৮৮-এ-০০-৯৭-০০০৩২-০০)

চিত্র ৩: মতলবে পাঁচ বছরের কম-বয়সী অসুস্থ শিশুদের আইএমসিআই এবং আইএমসিআই-বহির্ভূত প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিতির সংখ্যা

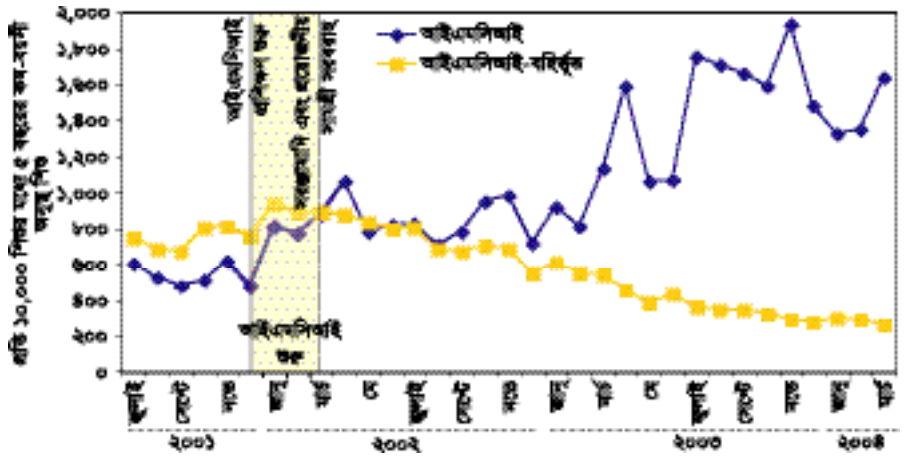

মন্তব্য

গবেষণালব্ধ এসব ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমানে এসব প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে অসুস্থ শিশুদের যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় তা খুব নিম্নমানের। রোগ-নির্ণয়ের লক্ষ্যে অসুস্থ শিশুদের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তা থাকে অসম্পূর্ণ এবং তাদের অসুস্থতা সনাক্তকরণে ভুল হয় অথবা অসম্পূর্ণরূপে তা করা হয়। বেশিরভাগ শিশুই সঠিক চিকিৎসা পায় না। আইএমসিআই কার্যক্রমের ফলে আইএমসিআই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে শিশুস্বাস্থ্যসেবার মান বেড়েছে এবং শিশুস্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য শিশুদের উপস্থিতির হার তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ-গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজটি সরকার নিজে করছে। সুতরাং গবেষণার এ-ফলাফলসমূহ সরকারের একই রকম সুবিধাসম্বলিত অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য হবে। আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, আইএমসিআই-এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গবেষক দল এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গঠিত এক চুক্তির প্রতিফলন ঘটেছে, যা নিশ্চিতভাবে ইন্টারভেনশন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কলা-কৌশলসমূহ জাতীয়ভাবে আইএমসিআই-এর পরিধি বিস্তারের জন্য প্রণীত নীতিমালা এবং সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অদ্যাবধি সংগৃহীত এ-গবেষণা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিশুস্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-বিষয়ক সহযোগিতা এবং পরিবার ও কমিউনিটির সেবা-ব্যবস্থা-সম্বলিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আইএমসিআই কলা-কৌশলের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব। এ-ব্যবস্থা সেবা নিতে আসার অভ্যাসের পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্য সেবার

ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও অগ্রণী-ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে আইএমসিআই-এর ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে হলে এবং এ-ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষ বিজ্ঞানীদল এবং জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে পূর্ণ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। তাছাড়া এঁদের সকলের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রধান বিষয়গুলির উন্নতিসাধনের সদিচ্ছা থাকতে হবে। এ-গবেষণার ক্ষেত্রে সুপারভাইজার পদের কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে যাতে তাঁরা আরো ঘন ঘন কাজের তদারকি করতে পরেন এবং আশানুরূপ সেবার মান বাড়ানোর জন্য প্রতিবার তাঁদের পরিদর্শনের সময় প্রয়োজনীয় আরো কার্যাবলি কার্যতালিকায় সংযোজন করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সরকার-কর্তৃক ব্যবহৃত উন্নতমানের ফরম পরিবর্তন করে আরো তথ্যবহুল করা হয় যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরো সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন। শিশুদেরকে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। সার্বজনীন না হলেও আইএমসিআই কার্যক্রমের পরিধি ছিলো যথেষ্ট এবং গবেষণাকালীন তা একই রকম ছিলো। ফলে সব শিশুকেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আইএমসিআই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিষয় এবং অভিজ্ঞতাকে আইএমসিআই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয়ভাবে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গবেষক দল বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মতলবে যে বিষয় এবং পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা আইএমসিআই কার্যক্রমের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং তা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৪৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

বাংলাদেশে ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ওপর দেশব্যাপী সমীক্ষা

বাংলাদেশে ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ধরন মূল্যায়নের জন্য জাতীয়ভাবে (প্রতিনিধিত্বমূলক) বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারের ওপর একটি গুচ্ছ (ক্লাস্টার) সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষাটি শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যে ডায়রিয়া-আক্রান্ত মোট ৭,২৪৭ জন শিশুকে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাড়ির বাইরে যেসব শিশু স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৯২% প্রাইভেট সেবাদানকারীদের কাছে গেছে, যাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই ডিগ্রীধারী (এমবিবিএস) চিকিৎসক ছিলেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ৭০%-এর অধিক খাবার স্যালাইন ব্যবহার করেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ৫০%-এর কম অধিবাসী তা ব্যবহার করেছে। সকল আয়ভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে ডায়রিয়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত খরচের পরিমাণ মোটামুটিভাবে একই রকম ছিলো এবং তা ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকসহ খাবার স্যালাইনের জন্য আমাদের অনুমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

শিশুদের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ডায়রিয়া, যা প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম-বয়সী ২০ লক্ষ শিশুর জীবনহানি ঘটায় (১)। সময়মত রোগীকে খাবার স্যালাইন প্রদান এবং স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে এসব মৃত্যুর অধিকাংশই রোধ করা সম্ভব। কিন্তু দক্ষিণ-এশিয়া এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশসমূহের মাত্র এক-তৃতীয়াংশেরও কম শিশুর ক্ষেত্রে এ-ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় (২)। খাবার স্যালাইন ছাড়া সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থার মধ্যে একটি হচ্ছে জিংক,

যা পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারে (৩)। 'ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্প'-এর মাধ্যমে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পাঁচ বছরের কম-বয়সী সকল ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুকে জিংক চিকিৎসা দেওয়া হবে। এ-কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত জাতীয় এ-সমীক্ষার মাধ্যমে বাড়িতে ডায়রিয়া-চিকিৎসার ধরন, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহের ব্যবহার, অসুস্থতা-সংক্রান্ত খরচ, ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য, আয় এবং ভৌগলিক অবস্থান-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশে জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধনের সাথে সাথে ডায়রিয়া চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেছিলো কি না তা মনিটর করা সম্ভব হবে।

এ'টি ছিলো জাতীয়ভাবে (প্রতিনিধিত্বমূলক) বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারের ওপর একটি গুচ্ছ (ক্লাস্টার) সমীক্ষা। সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– সিটি কর্পোরেশন, জেলাস্থ পৌরসভা এবং গ্রামাঞ্চল। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দু'টি শহর ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। 'প্রপর্শনেট প্রবাবিলিটি র‍্যানডম স্যাম্পলিং' পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের প্রতিটি থেকে একটি করে জেলা নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে ৬০টি এবং পৌরসভা থেকে ২০টি করে গুচ্ছ এলাকা দৈবচয়নের ভিত্তিতে (র‍্যানডমলি) নির্বাচন করা হয়। 'প্রপর্শনেট প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং' পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশন থেকে ২০টি বস্তি এবং ২০টি বস্তি-বহির্ভূত গুচ্ছ এলাকা নির্বাচন করা হয়। এভাবে ৫৬০টি ছোট ছোট এলাকা নির্বাচন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বর্ধিত টিকাদান কর্মসূচির জন্য প্রণীত পরিবর্তিত গুচ্ছ-সমীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে (৪) ২০০৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রতিটি গুচ্ছ এলাকার সকল পরিবারের কাছে যাওয়া হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে ছয় থেকে ৫৯ মাস বয়সী (বিগত দু'সপ্তাহে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা যাবৎ উল্লিখিত বয়সী যারা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ছিলো) ডায়রিয়া রোগীসম্বলিত ১৫টি পরিবার সনাক্ত করা যায়। যেসব পরিবারে ডায়রিয়া রোগী ছিলো তাদের কাছ থেকে ১৫ মিনিট ধরে ডায়রিয়া-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া হয়। পরিবারের সম্পদের পরিমাণ (অ্যাসেট স্কোর) অনুযায়ী তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করা হয় (৫)। প্রত্যেকটি পরিবারের ক্ষেত্রে প্রথমে সকল সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং পরে এক-চতুর্থাংশ অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে হিসাব ভাগ করা হয়।

সমীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত মোট ৭,২৪৭ জন শিশুকে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্যেক এলাকায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ছিলো বলে জানা গেছে (সারণি ১)। ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতা সবচেয়ে কম দেখা গেছে শহরের বস্তি-বহির্ভূত এলাকায় এবং দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়া সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে শহরের বস্তি এলাকায়, যেখানে এক-চতুর্থাংশ শিশু দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়ায় ভুগেছে (সারণি ১)। বিভিন্ন এলাকার শিশুরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে সেবা নিয়েছে (সারণি ২)। শহরের বস্তি-বহির্ভূত এলাকার যারা বাড়ির বাইরে থেকে সেবা নিতে গেছে, তারা প্রধানত ডিগ্রীধারী অ্যালোপ্যাথিক (এমবিবিএস) চিকিৎসা প্রদানকারীদের কাছ থেকেই সেবা নিয়েছে (৩৪.৪%)।

অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৬.৮% শিশু ডিগ্রীধারী চিকিৎসা-প্রদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। শহরের বস্তি এলাকায় প্রধান চিকিৎসা-প্রদানকারী ছিলো ওষুধ বিক্রেতাগণ (৪২.৫%) এবং গ্রামাঞ্চলে ডিগ্রীবিহীন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রদানকারীগণ (গ্রামীণ ডাক্তার/হাতুড়ে ডাক্তার) (৪০.৯%)। বাড়ির বাইরে যারা চিকিৎসা-সেবা নিতে গেছে তাদের ৯০%-এর বেশি প্রাইভেট চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারীদের শরণাপন্ন হয়েছে। বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম যদিও পরিব্যাপ্ত, তথাপি শতকরা একভাগেরও কম ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশু এনজিওর অধীন সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে সেবা নিয়েছে।

সারণি ১: পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৈশিষ্ট্যসমূহ	গ্রামাঞ্চল ২৪০টি ক্লাস্টার সংখ্যা=৪,০৫৭	পৌরসভা ১২০টি ক্লাস্টার সংখ্যা=১,৯৮৩	সিটি কর্পোরেশন বস্তি ৪০টি ক্লাস্টার সংখ্যা=৬৪৭	সিটি কর্পোরেশন বস্তি-বহির্ভূত ৪০টি ক্লাস্টার সংখ্যা=৬৪০
গড় বয়স (মাস), (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন)	২৭.১ (১৪.৪)	২৬.৯ (১৪.৯)	২৭.৮ (১৪.৬)	২৭.২ (১৪.৮)
ছেলে (%)	৫১.৯	৫৩.৬	৫৩.৯	৫৬.১
মেয়ে (%)	৪৮.১	৪৬.৪	৪৬.১	৪৩.৯
ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতা				
রক্তযুক্ত (%)	১০.৬	৪.০	৮.২	৮.৪
৭ দিনের বেশি স্থায়ী (%)	১৮.১	১৮.৭	২৪.৮	১৮.৩
সার্বিক হার	০.২৪	০.২১	০.২১	০.১৫

সারণি ২: পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী শিশুদের তত্ত্বাবধায়কদের চিকিৎসা-সেবা গ্রহণের ধরন

	জেলা		সিটি কর্পোরেশন	
	গ্রামাঞ্চল %	শহরাঞ্চল %	বস্তি %	বস্তি-বহির্ভূত %
চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারী				
ডিগ্রীধারী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক (এমবিবিএস)	৬.৮	২২.৮	১৪.২	৩৪.৪
ডিগ্রীবিহীন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক	৩০.৯	১২.৫	১৮.০	১২.৫
ওষুধ বিক্রেতা	৯.৬	১৪.৪	২৪.৫	১৭.৩
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক	১০.৬	১০.৪	৪.৩	৩.৮
অন্যান্য	২.২	১.৬	০.৭	০.৬
কারো কাছ থেকে সেবা নেয় নি	৩৯.৯	৩৮.৩	৩৮.৪	৩১.৪
চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারী সংস্থা (সেক্টর)*				
প্রাইভেট	৯৩.৭	৮৫.৫	৯৩.৭	৮৭.৪
সরকারি (পাবলিক)	৬.০	১৩.৫	৬.০	১১.৭
বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)	০.৩	১.০	০.৩	০.৯

* যারা চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারীর কাছে সেবা চেয়েছিলো

সিটি কর্পোরেশনের বাইরে চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুর সংখ্যা প্রায় একই রকম ছিলো (সারণি ৩)। তবে সিটি কর্পোরেশনের বস্তি-বহির্ভূত এলাকায় চিকিৎসা প্রদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি ছিলো (৭৪.১% বনাম ৬৪.১%, পি <০.০১) এবং তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ডিগ্রীধারী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা নিয়েছে (৪৫.১% বনাম ৩৫.৩%, পি <০.০১ (সারণি ৩)। এই একই জনসংখ্যার মধ্যে ছেলেদের জন্য ডায়রিয়া চিকিৎসার প্রত্যক্ষ খরচ বেশি করতে দেখা গেছে (গড় খরচ ৩৬ টাকা বনাম ২৭ টাকা, পি <০.০১)।

সারণি ৩: পারিবারিক অবস্থান এবং লিঙ্গ অনুযায়ী ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুর জন্য চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারী এবং ডায়রিয়া চিকিৎসার ধরন

চিকিৎসা	গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল		সিটি কর্পোরেশন			
					বস্তি		বস্তি-বহির্ভূত	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
যেকোনো চিকিৎসক দেখেছেন (%)	৬১.০	৫৮.৮	৬১.৩	৬১.৭	৬৪.২	৫৮.৭	৭৪.১	৬৪.১**
ডিগ্রীধারী চিকিৎসক দেখেছেন (%)	৭.১	৬.১	২৩.৮	২০.৪*	১৬.১	১১.৪	৪৫.১	৩৫.৩**
খাবার স্যালাইন পেয়েছে (%)	৪৮.৮	৪৮.৫	৫৮.৯	৫৮.৩	৭০.৭	৭১.৮	৮০.৮	৮২.৯
খাবার স্যালাইন বা অন্য কোনো রিহাইড্রেশন ফ্লুইড পেয়েছে (%)	৫৯.২	৫৯.৫	৬৬.৮	৬৬.০	৭৮.২	৭৮.৫	৮৫.২	৮৭.২
জীবাণুনাশক ওষুধ পেয়েছে (%)	৩৫.৯	৩০.৭***	৩৯.৭	৩৭.৩	৪০.২	৩৪.৬	৫৮.২	৪৬.৩**
ওষুধের জন্য গড় খরচ (টাকায়)	২৫.০	২৩.০	২৮.০	২৫.০	২০.০	১৮.০	৩৬.০	২৭.০

পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য: *পি<০.০৫, **পি<০.০১, ***পি<০.০০১

যেসব পরিবারে সম্পদের পরিমাণ (অ্যাসেট কোয়ার্টাইলস) অপেক্ষাকৃত বেশি ছিলো তাদের মধ্যে চিকিৎসা-প্রদানকারীদের কাছ থেকে চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার হার ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (পি <০.০১ অথবা পি <০.০০১)। তাদের মধ্যে ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার হার এবং খাবার স্যালাইন অথবা জীবাণুনাশক ওষুধ খাওয়ার হারও বেশি ছিলো (সারণি ৪)। সম্পদ যাই থাকুক না কেন শহরে ৫০%-এর বেশি পরিবারে রোগীদের খাবার স্যালাইন খাওয়ানো হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সবচেয়ে গরীব শ্রেণীর পরিবারেও ৭০%-এর বেশি ডায়রিয়া রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো হয়েছে। যেসব পরিবারে সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিলো তারা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ডায়রিয়া-আক্রান্ত সব শিশুদের মধ্যে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর হার ছিলো ৫০%-এর কম। সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে সম্পদশালী (চতুর্থ কোয়ার্টাইল) এবং সবচেয়ে গরীব (প্রথম কোয়ার্টাইল) শ্রেণীর পরিবারসমূহ ছাড়া সব শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা-সম্পন্ন পরিবারেই অসুস্থতাজনিত খরচের পরিমাণ ছিলো মোটামুটি একই ধরনের। তবে জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহারও ছিলো বেশি।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন

সারণি ৪: অ্যাসেট কোয়ার্টাইল এবং শিশুর পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুর জন্য চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারী এবং ডায়রিয়া চিকিৎসার ধরন

চিকিৎসা	গ্রামাঞ্চলের অ্যাসেট কোয়ার্টাইল				পৌরসভা				সিটি করপোরেশন			
	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
যেকোনো চিকিৎসক দেখেছেন (%)	৫৪.৬	৫৮.৯	৬৩.৪	৬২.৫★★★	৫৫.৭	৬০.৩	৬১.২	৬৯.৪★★★	৫৯.৮	৬৫.৬	৬৭.৭	৬৯.৩★★
ডিগ্রীধারী চিকিৎসক দেখেছেন (%)	৫.২	৫.৯	৫.৬	১০.৪★★★	১৪.৩	১৯.৬	২০.৩	৩৬.৯★★★	২১.২	২০.৬	৩৩.২	৩৪.২★★★
খাবার স্যালাইন পেয়েছে (%)	৪৫.২	৪৭.৪	৪৮.০	৫৪.৩★★★	৫২.৭	৫৬.৩	৫৮.৬	৬৬.২★★★	৭২.৮	৭২.৪	৭৫.৯	৮৪.৫★★
খাবার স্যালাইন বা অন্য কোনে রিহাইড্রেশন ফুইড পেয়েছে (%)	৫৪.৮	৬২.১	৬০.৬	৬০.৮★★★	৬৪.৭	৬০.৬	৬৮.৫	৭২.৯★★★	৭৭.২	৮২.০	৮৩.৪	৮৮.৫★★
জীবাণুনাশক ওষুধ পেয়েছে (%)	২৯.৬	২৬.৫	৩৪.১	৪২.৩★★★	৩১.৫	৩৬.১	৩৮.৬	৪৮.০★★★	৩৫.২	৪২.৬	৪৭.৩	৫৫.৫★★★
ওষুধের জন্য গড় খরচ (টাকায়)	২৩.০	২০.০	২৪.০	২৬.০	২০.০	২৩.০	২৫.০	৩৮.০★★★	১৮.০	২৪.০	২৭.০	৩৫.০★★★

পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী অ্যাসেট কোয়ার্টাইলের মধ্যে পার্থক্য: ★পি<০.০৫, ★★পি<০.০১, ★★★পি<০.০০১

মন্তব্য

বাংলাদেশব্যাপী শিশুদের ডায়রিয়াজনিত চিকিৎসা-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর প্রাধান্য বিস্তার করছে। এখনো বেশিরভাগ মানুষ ডিগ্রীবিহীন চিকিৎসক, যেমন– হাতুড়ে ডাক্তার, ওষুধ বিক্রেতা অথবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের কাছ থেকেই চিকিৎসা-সেবা নিতে পছন্দ করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিতে জিংক চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিগ্রীবিহীন প্রাইভেট চিকিৎসকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

যারা কোনো সেবাপ্রদানকারীর কাছে গেছে, তাদের মধ্যে বেসরকারি (এনজিও) এবং সরকারি চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ১৫%-এর কম। প্রাইভেট চিকিৎসকগণের কাছ থেকে সহজেই এবং যেকোনো সময় সেবা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ সাধারণত দিনের বেলায়ই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি ক্লিনিকসমূহের ব্যবহার শতকরা একভাগেরও কম হওয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহের মধ্যে হতে পারে– গ্রামাঞ্চলের যে এলাকাসমূহ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেসব এলাকায় কোনো বেসরকারি ক্লিনিক চিকিৎসা প্রদান করে না (বেসরকারি সংস্থাসমূহকে শহরাঞ্চলে কর্মরত দেখা যায়), অথবা চিকিৎসা-সেবা গ্রহণকারীগণ বেসরকারি ক্লিনিককে প্রাইভেট ক্লিনিকের মতো একই রকম মনে করে থাকে, তাই তারা সেখানে না গিয়ে বরং প্রাইভেট ক্লিনিকে যেতে পছন্দ করে।

শিশুদের ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার চিকিৎসায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এ-সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, শিশুর

আবাসস্থলের ওপরও এ ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলের ৯০%-এর বেশি এবং শহরের ভিতরের বস্তি এলাকার ৭৫%-এর বেশি রোগী ডিগ্রীবিহীন সেবাপ্রদানকারীদের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে রোগীর তত্ত্বাবধায়কগণ ডিগ্রীবিহীন চিকিৎসা-সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে বেশি সেবা নেন (৬-৮)। ভারতে তত্ত্বাবধায়কদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার ব্যবস্থাপনা নিজেরাই করতে পছন্দ করেন। এ-তথ্য সঠিক হতে পারে কারণ সেখানে খাবার স্যালাইনের ব্যবহার অনেক বেশি এবং সমীক্ষায় সম্পূর্ণ অসুস্থতাকালের সব তথ্য নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কোনো শিশুর জন্য চিকিৎসা-সেবা নিতে যাওয়ার বিষয়টি মূলত নির্ভর করে তার তত্ত্বাবধায়কের ইচ্ছার ওপর। যদি তিনি মনে করেন যে, শিশুটির ওষুধের প্রয়োজন আছে, তখনই শিশুকে চিকিৎসা-সেবার জন্য বাইরে নেওয়া হয়। কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ওষুধ না দেওয়া হলে সেই সাক্ষাৎকে সময়ের অপচয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত চিকিৎসা-সংক্রান্ত যেসব ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে জীবাণুনাশক (এন্টিবায়োটিক) ওষুধের ব্যবহার-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্রই প্রধান, তবে ডায়রিয়া নিরাময়কারী (এন্টিডায়রিয়াল), এন্টিহিস্টামিন এবং ভিটামিনও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে যতজনের ডায়রিয়া হয়েছে তাদের সংখ্যানুযায়ী ডায়রিয়ার ব্যাপকতা পরিমাপ করা হয়েছে। পরে এ-সংখ্যাসমূহ যোগ করে গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে ডায়রিয়ার ব্যাপকতা নির্ণয় করা হয়েছে। এ-ধরনের গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার ব্যাপকতা নির্ণয় হয়তোবা সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে। গুচ্ছ নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতিতে ডায়রিয়ার ব্যাপকতার মাত্রা প্রকৃত মাত্রা থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (৯)। সাধারণত যেসব রোগীর ডায়রিয়ার মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে ক্রস-সেকশনাল সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাদের তত বেশি হবে। এ'টি দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়ার সংখ্যা বেশি পাওয়ার কারণ হতে পারে। এতদসত্ত্বেও, এ–পদ্ধতি ডায়রিয়া এবং এ-সংক্রান্ত চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, অধিক হারে শিশুরা ডায়রিয়ার সময় খাবার স্যালাইন পেয়েছে। এই তথ্য ২০০৪ সালের 'বাংলাদেশ জনমিতিক এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষা (বিডিএইচএস)'-র প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (১০)। এই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে ৭৭% এবং গ্রামাঞ্চলে ৬৫% শিশুকে ডায়রিয়ার সময় খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। যেহেতু জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, সেহেতু খাবার স্যালাইন ব্যবহার কমেছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ লক্ষ্য করা গেছে (১১-১৪)। তবে এ-প্রবণতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমে গেছে অথবা বন্ধ হয়ে গেছে। (১০,১৫,১৬)। যেমন– বিডিএইচএস-এর ২০০৪ সালের প্রতিবেদনে খাবার স্যালাইন এবং অন্যান্য রিহাইড্রেশন ফ্লুইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে অথবা ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় নি

(১০)। আমাদের এ-সমীক্ষায় ডায়রিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা ছেলেদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় লক্ষ্য করেছি, তবে তা ছিলো নির্ধারিত অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে এ-প্রবণতা দেখা গেছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বস্তি-বহির্ভূত এলাকায় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাপন্নদের মধ্যে। এসব পরিবারে অতিরিক্ত টাকা থাকার কারণে হয়তো এ-জাতীয় প্রবণতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। সারণি ৪-এ দেখা যায় যে অন্যান্য আয়-ভিত্তিক শ্রেণীর পরিবারগুলোর ডায়রিয়া চিকিৎসার মোট খরচের মধ্যে খুব কম পার্থক্য রয়েছে এবং এই খরচের পরিমাণ তাদের সামর্থ্যের সর্বাধিক পরিমাণকে প্রতিফলিত করে।

দেশব্যাপী ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক-এর ব্যবহার বাড়ানোর ওপর কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকার ফলে বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসার ওপর বড় ধরনের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করার একটি অসাধারণ সুযোগ আমরা পেয়েছি। এ-সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আমরা কিছু উৎসাহব্যাঞ্জক প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, যেমন– অনেক বেশি শিশুর খাবার স্যালাইন অথবা অন্যন্যা রিহাইড্রেশন ফ্লুইড গ্রহণ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসা। এ-সমীক্ষা ২০০৬/২০০৭ সালে পুনরায় পরিচালিত হবে এবং এর ফলে জিংক-এর ব্যবহার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কাজ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মে ২০০৪-এপ্রিল ২০০৫

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=১১০)	*ভি. কলেরি* ০১ (সংখ্যা=৭১৪)	*ভি. কলেরি* ০১৩৯ (সংখ্যা=২)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩৮.২	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	১০০.০	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৬৩.৬	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৫.৫	০.৮	৫০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৯.০	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৭২.৮	১০০.০
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৭৫.৯	১০০.০
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.৪	৫০.০

২৮টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: সেপ্টেম্বর ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট (সংখ্যা=২৮)
	প্রাইমারি (সংখ্যা=২৬)	একোয়ার্ড * (সংখ্যা=২)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৩ (৫০.০)	২ (১০০.০)	১৫ (৫৩.৬)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	২ (৭.৭)	২ (১০০.০)	৪ (১৪.৩)
ইথামবিউটল	১ (৩.৮)	১ (৫০.০)	২ (৭.১)
রিফাম্পিসিন	১ (৩.৮)	০ (০.০)	১ (৩.৬)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	১ (৩.৮)	০ (০.০)	১ (৩.৬)
অন্যান্য ওষুধ	১৩ (৫০.০)	২ (১০০.০)	১৫ (৫৩.৬)

( ) শতকরা হার *১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

প্রতিমাসে প্রাপ্ত* ভি. কলেরি **০১**, ভি. কলেরি **০১৩৯**, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: মে ২০০৪-এপ্রিল ২০০৫*

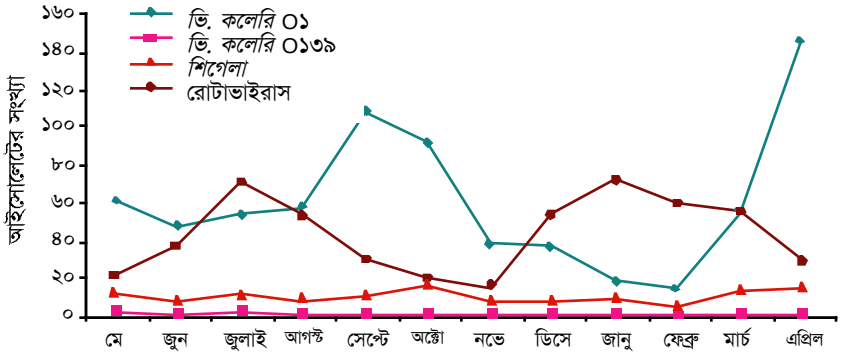

*সার্ভিলেন্সের জন্য আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্য হতে ২% রোগীর মল পরীক্ষা করা হয়েছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫ (সংখ্যা=১৮)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এ্যাজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২২.২	০.০	৭৭.৮
পেনিসিলিন	৩৩.৩	১১.১	৫৫.৬
স্পেক্টিনোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	২২.২	৫.৬	৭২.২
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বি-র অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ডস্, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দাতা দেশসমূহ।

ছবি : একজন সার্ভিলেন্স কর্মী একটি শিশুর মধ্য-বাহুর পরিধি মাপছেন
(সৌজন্যে - ডা: এমএ সালাম)

সম্পাদকমণ্ডলি	স্টিফেন পি. লুবি পিটার থর্প এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদনা বোর্ড	চার্লস পি লারসন এমিলি গারলী
অতিথি সম্পাদক	আনোয়ার হোসেন
যাঁরা লেখা দিয়েছেন	এমএ সালাম শামস্ এল আরেফিন চার্লস পি লারসন
কপি সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ	এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং	মাহ্বুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

এ-সংখ্যাটির পিডিএফ এবং পূর্ববর্তী সকল সংখ্যার পিডিএফ-এর জন্য আমাদের ওয়েব সাইট ভ্রমণ করুন:
www.icddrb.org/hsb